Journal of Rajshahi College, **Vol. 1, Nos. 1 & 2, 2023, pp. 161-181**

শিলালেখ-তাম্রশাসনাদিতে প্রাচীন বাংলার গ্রাম-স্থাননাম ও সমাজ

মোঃ আব্দুল মতিন*

Abstracte

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সামাজিক অবস্থার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। প্রাচীন বাঙালির মানস সংস্কৃতি ও গ্রাম-স্থাননাম সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার কথা ধ্রুপদি সাহিত্যসমূহে। কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চর্যাগীতি, সদুক্তিকর্ণামৃত, প্রাকৃত পৈঙ্গল, রামচরিত এবং পবনদূত ব্যতীত আর কোন গ্রন্থে বাঙালি জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখ নেই। যা বিবরণ আছে তাও পর্যাপ্ত নয়। পরবর্তীকালে পুরনো কাহিনী, উপাখ্যান, বংশাবলি, কুলজি, ঘটকের পুঁথির উপর নির্ভর করে সমকালীন জীবন ও ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয়। বাংলার অজ্ঞাত প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠনের অন্যতম সহায়ক উপাত্ত হলো লেখমালা-তাম্রশাসন, পোড়ামাটির ফলক, মুদ্রা, ধ্রুপদি সাহিত্য, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ প্রভৃতি। সে কারণে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কিছু নবীন ঐতিহাসিক মুদ্রা, শিলালেখ, তাম্রশাসন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন সুদৃঢ় হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা, জীবন-দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিঘাতে বাংলায় আধুনিক ইতিহাসচর্চার উন্মেষ ঘটে। ১৮০০-১৮৭০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বাঙালির আধুনিক ইতিহাস চেতনার উন্মেষপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাস গবেষণায় প্রাধান্য পেয়েছিল প্রাচীন বাংলা ও ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনকল্পে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও গবেষণা। বিশ শতকের বাঙালি ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রাচীন মুদ্রা, শিলালেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করে ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সমাজের মূল উপাদান হলো ভৌগলিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এসব সংঘবদ্ধ এবং গ্রাম-স্থাননামসহ সামগ্রিক পরিচয়ের আভাস মেলে সমসাময়িককালে প্রণীত লিপিমালা-প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসনে। আলোচ্য প্রবন্ধে শিলালেখ-তাম্রশাসনাদিতে উল্লেখিত প্রাচীন বাংলার গ্রাম-স্থাননাম ও সমকালীন সমাজচিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

Keywords: *শিলালেখ-তাম্রশাসন; স্থাননাম; জনপদ; সমাজ*

ভূমিকা

রাষ্ট্র হিসেবে নতুন হলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচারে বাংলাদেশ বেশ প্রাচীন। যথাযথ উপাদানের অভাবে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস

* ড. মোঃ আব্দুল মতিন, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ই-মেইল: mdabdulmatin16b@gmail.com

♦ **Article** received on 17 September, 2023 & accepted on 15 October, 2023.

To cite the article: মতিন, মোঃ আব্দুল (২০২৩)। শিলালেখ-তাম্রশাসনাদিতে প্রাচীন বাংলার গ্রাম-স্থাননাম ও সমাজ। *Journal of Rajshahi College*, 1(1 & 2), 161-181.

আজও অনেকটা অস্পষ্ট। মূলত এদেশের ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদান হলো লেখমালা। আর লেখমালাগুলো অধিকাংশই রচিত হয়েছিল রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। ফলে লিপিমালাগুলো রাজা বা রাজবংশের গুণকীর্তনে মুখরিত এবং পক্ষপাত দুষ্ট। তবে লিপির রচনাকারেরা সমকালীন রাজনৈতিক বা সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। যে কারণে এসব লিপিতে স্থান পেয়েছে সমকালীন রূঢ় বাস্তবতা। সমাজ ও সমাজের মূল উপাদান মানুষ। আবার পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আদিকাল থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস রচনার প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে মূলতঃ সমসাময়িক শিলালিপি, কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ, প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক, সংকলন গ্রন্থ, ধর্ম শাস্ত্র, বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম গীতিসংগ্রহ চর্যাপদ, চৈনিক বিবরণ, দিল্লীর ঐতিহাসিকদের বিবরণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর। এতদ্বসত্ত্বেও গুপ্তযুগের পূর্বের বাংলার ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস প্রণয়ন করা অতি কষ্টসাধ্য। কারণ গুপ্তপূর্ব যুগের ইতিহাস লেখার উপাদান আমাদের হাতে খুব কম। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে সমগ্র বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়কালের বেশ কয়েকটি শিলালিপি, তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় এ প্রমাণ আরও শক্তিশালী হয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিলেখমালা প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস বিনির্মাণের আঁকর উপাদান। শিলালেখ-তাম্রপট্টোলিতে লোকায়ত বাংলার সামাজিক জীবনের চালচিত্র ও গ্রাম-স্থাননামসহ বিবিধ বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান এ প্রবন্ধ উপস্থাপনের মূল লক্ষ্য।

বাংলায় শিলালেখ-তাম্রশাসনাদি চর্চার সূত্রপাত

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে লেখমালাভিত্তিক গবেষণাকর্মের সূত্রপাত রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্স সোসাইটি ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে। এ বিষয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজমালা' (রাজশাহী, ১৯১২), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'গৌড়লেখমালা' (রাজশাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), ননীগোপাল মজুমদারের 'ইন্সক্রিপশনস অফ বেঙ্গল', ৩য় খণ্ড (রাজশাহী, ১৯২৯), পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের 'কামরূপ শাসনাবলী' (রংপুর, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), কমলাকান্ত গুপ্তের ' কপারপ্লেটস্ অফ সিলেট' (সিলেট, ১৯৬৭), আর. আর. মুখার্জী ও এস. কে. মাইতি সম্পাদিত 'কপার্স অফ বেঙ্গল ইন্সক্রিপশনস' (কলকাতা, ১৯৫৬) এবং দীনেশচন্দ্র সরকার রচিত 'এপিগ্রাফিক ডিস্কভারিজ ইন ইস্ট পাকিস্তান' (কলকাতা, ১৯৭৩); শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ (সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮২)। এসব গ্রন্থগুলো বাংলার হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন ইতিহাসকে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে রচিত ব্যারি এম. মরিসনের 'পলিটিক্যাল এণ্ড কালচারাল রিজিয়নস ইন আর্লি বেঙ্গল' (দিল্লী, ১৯৮০) গ্রন্থটি উল্লেখের দাবি রাখে। এতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত লেখমালা সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক বিশদ আলোচনা রয়েছে। তাছাড়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে যখনই কোন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তখনই তার পাঠোদ্ধারের প্রয়াস চালিয়েছেন গবেষকবৃন্দ। ফলে পাথুরে প্রমাণভিত্তিক ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত বেশ সহজলব্ধ হয়েছে। তবে উক্ত গ্রন্থসমূহে প্রাচীন বাংলার যথাযথ ও বিস্তারিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে তেমনটা বলা মুশকিল।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উৎস অনুসন্ধান

বাংলার উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তস্থ অঞ্চলকে বলা হয়েছে প্রাচীন ব-দ্বীপাঞ্চল। ধারণা করা হয় এতদঞ্চলেই প্রথম জনবসতি শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে নতুন গড়ে উঠা ব-দ্বীপাঞ্চলেও। বাংলার পুরাতন ও ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠা নতুন ব-দ্বীপাঞ্চলে লোক বসতি শুরুর পর খুব ধীরগতিতে এতদঞ্চলে উন্নতির ছোঁয়া লাগলেও এটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন যে, এতদঞ্চলের কোথায় এবং কখন প্রথম জনবসতি গড়ে উঠেছিল। পলিমাটির দেশ বাংলায় যেহেতু প্রস্তরের একান্তই অভাব ছিল সেহেতু এতদঞ্চলে জীবনরক্ষাকারী প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ ছিল একরকম প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সে কারণে ভূ-তত্ত্ববিদগণ অনুমান করছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এতদঞ্চলে কোন জনবসতি গড়ে উঠেনি। কিন্তু প্রাচীন বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্বত্য প্রদেশে দুটি প্রত্নপ্রস্তর যুগের শিলানির্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, এছাড়াও বঙ্গদেশের সমতল অঞ্চলে সমসাময়িককালের আরও একটি প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু তাই নয় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যেসব অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি দেখতে প্রত্নপ্রস্তর যুগীয় অস্ত্র বলে শনাক্ত করেছেন অনেক ঐতিহাসিক।[১] বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বানগড় অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে যেসব প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দের এবং ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে ৭ম/৮ম শতকের প্রস্তরখণ্ডের সাথে যেক'টি প্রাচীন গুটিকা ও ছোরা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিকে নব্যপ্রস্তর যুগের বলে শনাক্ত করা হয়েছে।[২] সম্প্রতি নরসিংদীর বেলাবো উপজেলার উয়ারি ও বটেশ্বর গ্রামদ্বয় হতে প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর যুগের এবং লৌহযুগের বেশকিছু প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, প্রত্নপ্রস্তর যুগের হস্ত কুঠার (hand exe), কুঠার (celt), নব্যপ্রস্তর যুগের বাটালি (chisel), ছুরি, কুঠার এবং লৌহযুগের আকরিক লোহার তৈরি ত্রিকোণাকার হাতকুড়াল, লোহার ফলক, ছুরি, বাটালি, লোহার তৈরি ভারি হাতুড়ি, প্রচুর ছাপাংকৃত রৌপ্যমুদ্রা (Punch marked and cost coin)[৩], মূল্যবান পাথরের গুটিকা (Beads of semi precious stone), পোড়ামাটির ক্ষেপণীয় গোলক ও গোলতি (sling ball), এবড়ো-থেবড়ো এবং দীর্ঘগলদেশযুক্ত মৃৎপাত্র, শিলনোড়া, পাথর ও পোড়ামাটির শিবলিঙ্গ ইত্যাদি প্রধান। উয়ারি-বটেশ্বর রাজধানী ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও আঁড়িয়ালখাঁর মিলনস্থলের ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে কয়রা নামক একটি প্রাচীন নদীখাতের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এই গ্রামদ্বয় হতে যে পরিমাণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে অনুরূপ নিদর্শন বাংলাদেশের অন্য কোথাও থেকে পাওয়া যায়নি।[৪]

---

[১] রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৯ বাং, পৃ. ৫।

[২] A. K. M. Shamsul Alam, *Sculptural Art of Bangladesh*, Dhaka, 1985, P. 23, foot note no. 5.

[৩] *Indian Historical Quarterly*, Vol. X, 1934, p. 58; *Archaeological Survey of India Annual Report*, 1930-34, Part-1, pp. 35-39; Dr. Nazimuddin Ahmed, *Mahastan Mainamati and Paharpur*, Dhaka, 1966, p. 12.

[৪] ড. সুপ্তিকণা মজুমদার, *বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২।

১৮৬৫ সালে হুগলি জেলার কুনকুনে গ্রাম হতে প্রখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ V. Ball একটি হরিদ্রাভ রঙের প্রস্তর নির্মিত কুঠার ফলক আবিষ্কার করেন, সমসাময়িককালে রাণীগঞ্জের সন্নিকটস্থ বোখারার কয়লা খনি হতে একই জাতীয় আরেকটি প্রস্তর নির্মিত কুঠারফলক আবিষ্কৃত হয়।[৫] ১৮৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের সীতারামপুরস্থ ঝরিয়ার কয়লাখনি থেকেও অনুরূপ একটি প্রস্তর কুঠারফলক আবিষ্কৃত হয়েছে যা কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৬] উপর্যুক্ত তিনটি কুঠারফলকই প্রত্নপ্রস্তর যুগের বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পাথরের অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে V. Ball অনুমান করেছেন যে, প্রত্নপ্রস্তর যুগে এদেশীয় দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী নিজেদের নিরাপত্তা ও জীবিকা নির্বাহের জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে এসব অস্ত্র-শস্ত্র এতদঞ্চলে এনেছিলেন এবং এ দু'অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শত শত মাইলের দুরত্ব থাকলেও এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[৭] বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ঐ যুগের আরও কিছু নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৮৮৬ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে আবিষ্কৃত অশ্মীভূত কাঠের তৈরি একটি ছুরি। বিশেষজ্ঞগণ এ ছুরির সাথে ব্রহ্মদেশের ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাতানের আকৃতিগত সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন। সীতাকুণ্ড পাহাড় থেকে এধরনের আরও পাঁচটি হাতিয়ার পাওয়া গেছে। বর্তমানে এগুলোর একটি কলকাতা জাদুঘরে ও চারটি ব্রিটিশ জাদুঘরে রক্ষিত আছে।[৮] ১৯৬৩ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের আমজাদাতা ইউনিয়নের ছাগলনাইয়া থানায় পাওয়া গেছে প্রত্নপ্রস্তর যুগে ব্যবহৃত একটি প্রস্তর নির্মিত হাত কুড়াল। এটি বর্তমানে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এছাড়া ১৯৫৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতেও অনুরূপ একটি অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের সংরক্ষণে রয়েছে। বৃহত্তর কুমিল্লার ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননেও অনুরূপ প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর যুগের ব্যবহৃত মসৃণ-অমসৃণ সরু বাটওয়ালা হাত কুড়াল ও বাটালির সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়াও রৌপ্য বা তাম্রপাতের ছাপাংকৃত উভয়পাশে এক বা একাধিক প্রতীক উৎকীর্ণ অতি প্রাচীন কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই মুদ্রাগুলো খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকের মৌর্যপূর্ব ও মৌর্য যুগের বলে মনে করেন।[৯] প্রাচীন বাংলায় প্রত্নপ্রস্তর যুগীয় অস্ত্র-শস্ত্র, প্রস্তরখণ্ড বা অনুরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আবিষ্কৃত না হওয়ায় ভূ-তাত্ত্বিকগণ অনেকেই ধারণা করেন যে, প্রত্নপ্রস্তর যুগে এতদঞ্চলে স্থায়ী জনবসতি গড়ে উঠেনি, তবে যেসব অঞ্চলে প্রত্নপ্রস্তর যুগীয় প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে সেসবের অধিকাংশ স্থান ছাড়াও

---

[৫] V. Ball, *Stone Implements Found in Bengal*, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1865, PP. 127-128.

[৬] *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, 1867, P. 143.

[৭] *Proceedings of the Royal Irish Academy 2nd Series*, Vol. 1, 1867, P. 394.

[৮] ড. সুপ্তিকণা মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।

[৯] J. Coggin, *Catalogue of Pre-historic Antiquities in the Indian Museum*, Calcutta, 1917, P.130; A. H. Dani, *Pre-history and Protohistory of Eastern India*, Calcutta, 1960, P. 67, foote note 1; মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, *প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন : উয়ারি-বটেশ্বর*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১০-১৩।

অন্যান্য অনেক স্থানে আরও উন্নততর তীক্ষ অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব অস্ত্র-শস্ত্র ও মূল্যবান প্রত্নসম্পদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে ভূ-তাত্ত্বিকগণ এগুলোকে নব্যপ্রস্তর যুগীয় বলে শনাক্ত করেছেন। তাদের ধারণামতে, এসব অস্ত্র-শস্ত্র সমসাময়িকালে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিরাপত্তা ও জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে নির্মাণ ও ব্যবহার করেছিল।[১০] আবিষ্কৃত এসব নব্যপ্রস্তর যুগীয় প্রত্নসম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্রের এক বিরাট অংশ উত্তরবঙ্গের ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ধারণা করেন যে, এখান থেকেই এতদঞ্চলে প্রথম জনবসতি শুরু হয়। যদিও এ নিয়ে ভূ-তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

নব্যপ্রস্তর যুগের অব্যবহিত পরবর্তীকাল হল ধাতব অস্ত্রের যুগ। সমসাময়িক দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্রের পরিবর্তে ধাতব অস্ত্রের ব্যবহার শুরু করে। কারণ ধাতব অস্ত্র অধিক তীক্ষ ও কার্যকর। প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকে ধাতব যুগ পর্যন্ত যে সময়ের ব্যবধান এই সময়ের মধ্যে কিন্তু প্রাচীন বাংলায় যথেষ্ট স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল এবং উত্তর ভারতের গিরিপথ দিয়ে আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের সাথে সাথে পঞ্চনদ প্রদেশে সিন্ধু নদের অববাহিকায় নিজেদের আবাসভূমি গড়ে তুলেছিল। আর্যরা বৈদিক যুগের শেষদিকে উচ্চ গাঙ্গেয় অববাহিকায় আধিপত্য বিস্তার করে। পশ্চিমদিকে মরুভূমি থাকার কারণে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে আর্যরা আনুমানিক দুই/তিন শতকের মধ্যে মগধের কাছাকাছি স্থান পর্যন্ত নিজেদের অধিকার সীমা সম্প্রসারিত করে। এই সময়কাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ হতে ১২০০ অব্দের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে ঋক-সংহিতা (৩/৫৩/১৪), অথর্ববেদ (৫/২১/১৪), মানবধর্ম শাস্ত্র (১০/৪৩/৪৪) ও ঐতরেয় আরণ্যক (২/১/১) প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যসমূহকে ঐতিহাসিকগণ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন।[১১] এতদসত্ত্বেও প্রাচীন বাংলার কোন কোন অঞ্চলে, কোথায় এবং কিভাবে সর্বপ্রথম জনবসতি গড়ে উঠেছিল তার সঠিক প্রমাণ জানা দুরহ। তবে গুপ্তযুগের বেশ কিছু শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রাচীন বাংলার চালচিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। প্রাচীন বাংলার পরিচয়ের সন্ধান মেলে মূলত: প্রাচীন মুদ্রা, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, শিলালেখ, তাম্রশাসন বা তাম্রপট্টোলির মত নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের মধ্যে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে অভিলেখমালা, তাম্রশাসনসমূহ বা তাম্রপট্টোলি। ঐতিহাসিকগণ কেবল বাংলাদেশেরই নয়, সামগ্রিক অর্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঐ অভিলেখমালার অবদান অপরিসীম বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ঐ শিলালিপি, তাম্রশাসন বা তাম্রপট্টোলি যে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এতে রয়েছে যতটা না শাসকের কথা, তার চাইতে বেশি রয়েছে মধ্যবিত্তের কথা, নিম্নবিত্তের কথা তথা সাধারণ মানুষের কথা। রাজা প্রদত্ত তাম্রপট্টোলিতে শাসনদাতার নামের সাথে অধিকাংশ সময়ই ছোট

---

[১০] *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, 1870, P. 268.

[১১] ভিক্ষু সুনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভাস্কর্য খ্রিস্টীয় ৪র্থ হতে ১২শ শতক*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭।

বড় নানা কর্মচারির নাম, শাসন গ্রহিতার নাম ও বংশ পরিচয় পাওয়া যায়।[১২] লিপিসমূহেই দেখা যায় গরীব ব্রাহ্মণেরা গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপণের পর ধর্মরক্ষা এবং জীবন ধারণের জন্য রাজার নিকট থেকে ভূমিদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাজাও পূণ্যলাভের আশায় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করছেন। এ থেকে সমকালীন গ্রামীন জীবনেরও একটা চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

শিলালেখ-তাম্রশাসনাদিতে প্রাচীন বাংলার জনপদ পরিচিতি

যুগ যুগ ধরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, মহানন্দা, তিস্তা, সুরমা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদ-নদী এবং তাদের অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী বাংলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জনজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অতিপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল এসব নদ-নদী। তাছাড়া ঘন বসতিপূর্ণ শহর, বন্দর ও গ্রামগঞ্জের উত্থান-পতনে এসব নদ-নদীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই নদীগুলোর তীরে তীরে সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার জয়যাত্রা, গ্রাম, নগর, বন্দর, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুর বিকাশ।[১৩] বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত শিলালিপি, তাম্রপট্টোলি, ভাস্কর্য, প্রাচীন সাহিত্যকর্ম ও বিদেশি পর্যটকদের বিবরণসূত্রে বাংলার বেশকিছু প্রাচীন জনপদের সন্ধান মেলে। এই জনপদগুলো সাধারণত নদী, পর্বত বা অনুরূপ কোনো প্রাকৃতিক সীমানার দ্বারা পরস্পর থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। কালক্রমে এই জনপদগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৪] প্রাচীন সাহিত্য ও লেখমালাভিত্তিক সাক্ষ্যে বাংলায় নিম্নলিখিত জনপদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এগুলো হলো (ক) পুণ্ড্রবর্ধন, (খ) বরেন্দ্র, (গ) বঙ্গ, (ঘ) বঙ্গাল, (ঙ) সমতট, (চ) হরিকেল, (ছ) চন্দ্রদ্বীপ এবং (জ) পট্টিকেরা।

পুণ্ড্রবর্ধন

প্রাচীন সাহিত্য ও লেখমালায় পুণ্ড্রবর্ধনকে কখনও পুণ্ড্র, কখনও পৌণ্ড্র আবার কখনও পুণ্ড্রবর্ধন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পুণ্ড্র নামের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। তবে জাতি হিসেবে পুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে বৌধায়নধর্মসূত্র[১৫], সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র[১৬], মহাভারত[১৭], হরিবংশ[১৮], জৈন কল্পসূত্র[১৯] ও রামায়ণ[২০] প্রভৃতি গ্রন্থে। আবার 'দিব্যদান', 'রাজতরঙ্গিনী',

---

[১২] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *তাম্রপট্টোলীতে লোকায়ত বাংলা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১।

[১৩] Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. 1, Karachi, 1953, pp. 10-22.

[১৪] *Indian Historical Quarterly*, Vol. XXX, p. 40.

[১৫] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৩৭।

[১৬] *সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র*, ১৫.১৬।

[১৭] *মহাভারত*, ১.৪. ৫২-৫৫।

[১৮] *হরিবংশ*, ৩১.৩৩-৪২।

[১৯] Jacobi, *Sacred Book of the East*, Oxford, no date, p. 288.

[২০] *রামায়ণ*, ৪.৪০, ২৩-২৫।

'বৃহৎকথামঞ্জুরী' ও কিছু প্রাচীন লেখমালায়[২১] একটি সমৃদ্ধশালী নগর হিসেবে পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ আছে। প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ এই নগরীর অস্তিত্ব ছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক হতে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। বাঙালি কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন নগরকে বরেন্দ্রীর 'চূড়ামণি' বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'বসুধাশিরো বরেন্দ্রী-মণ্ডল-চূড়ামণ্যৈঃ-কুলস্থানম্।[২২] খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে রচিত 'করতোয়া মাহাত্মম' নামক একটি গ্রন্থে করতোয়া নদীর তীরবর্তী পুণ্ড্রবর্ধনকে (আদ্যং ভূবো ভবনম) মহাস্থান রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাস্থানে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের একখানি ব্রাহ্মীলিপিতে পুণ্ড্রনগরের নাম 'পুদলগল' হিসেবে উল্লেখ আছে। যা পুণ্ড্রনগর নামের প্রাকৃতরূপ বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।[২৩] তাছাড়া ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন[২৪], শ্রীধরদেবের (খ্রি. ১০ম শতাব্দী) পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি[২৫] ও কুমিল্লার ময়নামতিতে প্রাপ্ত বীরধরদেবের (খ্রি. ১৩শ শতাব্দী) চারপত্রমুড়া তাম্রলিপিতে[২৬] পুণ্ড্রবর্ধনের নাম ও পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির আয়তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতেও একটি সুনির্দিষ্ট রাজ্য হিসেবে পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৭]

বরেন্দ্র

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী হতে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে একটি নতুন জনপদের নাম পাওয়া যায়। লেখমালা সাক্ষ্যে বলা হয়েছে, বর্তমান রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা অঞ্চলের বৃহদাংশ এর অন্তর্গত ছিল। পাল সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত' কাব্যে বরেন্দ্রকে পালদের 'জনকভূ' (পৈত্রিক ভূমি) বলে অভিহিত করেছেন এবং এর অবস্থান দক্ষিণে গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া নদীর মাঝামাঝি বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮] পরবর্তীকালে বরেন্দ্র সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেনের রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তা 'বল্লালচরিতম' গ্রন্থ থেকে জানা যায়।[২৯] ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন

---

[২১] ধনাইদহ, *Epigraphia Indica*, Vol. XVII, pp. 345ff; পাহাড়পুর, *Epigraphia Indica*, Vol. XX, pp. 61ff; দামোদর তাম্রলিপি, *Epigraphia Indica*, Vol. XV, pp. 128ff.

[২২] R. C. Mojumder, R. G. Basak and N. G. Banerji (ed), *Ramacharitam of Sandhyakara Nandi*, Rajshahi, 1939, III. 10.

[২৩] *Epigraphia Indica*, Vol. XXI, pp. 83ff.

[২৪] Noni Gopal Mojumder (ed), *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, Rajshahi, 1929, pp. 140ff.

[২৫] Kamalakanta Gupta (ed), *Copper Plates of Sylhet*, Sylhet, 1967, pp. 95-152ff.

[২৬] F.A. Khan, *Mainamati*, Karachi, 1965, pp. 23-24.

[২৭] T.W. Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, Vol. II, London, 1905, p. 184.

[২৮] R.C. Mojumder, R.G. Basak and N.G. Banerji, *op.cit.* pp. 10-11.

[২৯] H.P. Sastri (Eng. Tran.), *Vallalacharitam of Anandabhatta*, Calcutta, 1901, p.14.

সিরাজ তাঁর 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে বরেন্দ্র বা বরিন্দকে রাঢ় বা রাল মিলে লখণৌতি রাজ্য গঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩০] জনপদ হিসেবে বরেন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে গয়াড়তুঙ্গদেবের তলচেরলিপি[৩১] এবং লক্ষণ সেনের তর্পণদীঘি[৩২] ও মাধাইনগর তাম্রলিপিতে।[৩৩] বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি[৩৪], কেওয়ার মূর্তিলিপিতেও[৩৫] একটি পৃথক ভৌগলিক অঞ্চল হিসেবে বরেন্দ্রের উল্লেখ আছে। লক্ষণ সেনের মাধাইনগর তাম্রলিপিতে বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত কান্তাপুরের নিকটবর্তী দাপানিয়াপাটক নামক গ্রামে লক্ষণ সেন কর্তৃক ভূমিদানের উল্লেখ আছে।[৩৬] বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রলিপি হতে বরেন্দ্রের এক গ্রামের নাম নাটারি ছিল বলে জানা যায়।[৩৭] উক্ত কান্তাপুরকে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের কান্তানগর এবং নাটারি গ্রামকে বর্তমান জেলা নাটোরকে পণ্ডিতেরা ইঙ্গিত করেছেন।[৩৮]

বঙ্গ

বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদসমূহের অন্যতম বঙ্গ। বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে। এতে বলা হয়েছে, 'বয়াংসি বঙ্গ-বগধাশ্চেরপাদাঃ।[৩৯] বৌধায়নধর্মসূত্রে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, মহাভারতে, রামায়ণে , অঙ্গুত্তর নিকায়ে, মিলিন্দ পঞহো প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে জাতি বা গোষ্ঠী হিসেবে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই প্রথম গ্রন্থ যেখানে বঙ্গকে একটি ভৌগলিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪১] কালিদাসের 'রঘুবংশম', জৈনদের 'উপাঙ্গপ্রজ্ঞাপন' বাৎসায়নের 'কামসূত্র', 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র' গ্রন্থে এবং চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিঙের বর্ণনায় বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে। লেখমালাসমূহের মধ্যে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের নাগার্জুনকুণ্ড লিপি[৪২] ও চতুর্থ শতকের মেহ্রৌলি লৌহস্তম্ভলিপিতে[৪৩] একটি ভৌগলিক অঞ্চল হিসেবে বঙ্গের সর্বপ্রাচীন

---

৩০ Major H.G. Reverty (Eng.Tran.), *Tabakat-i-Nasiri of Minhajuddin*, New Delhi, (Reprinted) 1970. pp. 584-585.

৩১ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, New Series, Vol. XII, p.293.

৩২ Noni Gopal Mojumder (ed), *op.cit.*, pp. 99ff.

৩৩ *Ibid*, pp. 195ff.

৩৪ Ramaranjan Mukharji and Sachindra Kumar Maity (ed), *Corpus of Bengal Inscriptions*, Calcutta, 1967, pp. 244ff.

৩৫ *Epigraphia Indica*, XVII, p. 355.

৩৬ Noni Gopal Mojumder (ed), *op.cit.*, pp. 105ff.

৩৭ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা*, রাজশাহী, ১৩১৯ বাং, পৃ. ১৩৩।

৩৮ R.C. Mojumder (ed), *History of Bengal*, Vol. 1, Dacca, 1943, p. 20.

৩৯ *Ibid*, p. 23.

৪০ *অঙ্গুত্তর নিকায়া*, ১.১৪.৩; *মিলিন্দ পঞহো*, ৭.৩.৪২।

৪১ R.P. Kangle, *The Kautiliya Arthasastra*, part 1, Bombay, 1960, p. 11.

৪২ *Epigraphia Indica*, XX, pp. 22-23.

৪৩ J.F. Fleet (ed), *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III, Calcutta, 1888, p. 141.

উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গের অবস্থান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ লিপি হলো সমাচার দেবের (আ. খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক) ঘুঘ্রাহাটি তাম্রলিপি।[৪৪] এতে বঙ্গের দুটি ভাগের উল্লেখ আছে। এগুলো হলো বিক্রমপুরভাগ এবং নব্যাবকাশিকা। পূর্ববাংলার বৃহত্তর প্রাচীন নগর ছিল বিক্রমপুর। নব্যাবকাশিকার মূল শাসনকেন্দ্র ছিল সূবর্ণবীথী। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে সুবর্ণবীথী নামের সাথে বৃহত্তর ঢাকা জেলার সোনারগাঁও (সুবর্ণগ্রাম), সোনারং ও সোনাকান্দা প্রভৃতি স্থানের নামের মিল রয়েছে।[৪৫] ঘুঘ্রাহাটি লিপিতে রাজা কর্তৃক দানকৃত বারকমণ্ডল বিষয়ের অন্তর্গত ধ্রুবিলাটি গ্রামকে ফরিদপুরের ধুলটগ্রাম বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।[৪৬] পাল রাজা প্রথম ভোজের (আ. খ্রি. ৮৩৬-৮৫ শতক) গোয়ালিয়র প্রস্তরলিপিতে পালরাজ ধর্মপালকে 'বঙ্গপতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৭] বৈদ্যদেবের (খ্রি. ১১শ শতক) কমৌলি লিপিতে[৪৮] 'অনুত্তরবঙ্গ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। লক্ষণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের (খ্রি. ১৩শ শতক) মদনপাড়া তাম্রলিপিতে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গের বিক্রমপুরভাগে ভূমি দানের উল্লেখ আছে।[৪৯] এই লিপিতে রাজা কর্তৃক দানকৃত পিঞ্জোকাষ্টি গ্রামকে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার পিঞ্জারী গ্রাম বলে মনে করা হয়।[৫০] একই রাজার সাহিত্য পরিষৎ তাম্রলিপিতে বঙ্গের 'নাব্য' অঞ্চলে রামসিদ্ধিপাটক গ্রামে ভূমি দানের উল্লেখ আছে। রামসিদ্ধিপাটক গ্রামকে বৃহত্তর বরিশাল জেলার গৌরনদীর রামসিদ্ধি গ্রাম বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।[৫১] লক্ষণীয় যে, লক্ষণ সেনের অপর পুত্র কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রলিপিতেও বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগের উল্লেখ আছে।[৫২] তবে বঙ্গদেশ নামকরণের কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী মুসলিম শাসকদের। ঢাকা ও ফরিদপুরের বিক্রমপুর অঞ্চল এবং বঙ্গের নাব্য এলাকা খুব সম্ভবত ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলা নিয়ে বঙ্গ গঠিত হয়েছিল।

বঙ্গাল

মধ্যযুগের শেষভাগে রচিত তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'ডাকার্ণব'-এ বঙ্গাল ছিল বঙ্গ ও হরিকেল রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি প্রশাসনিক অঞ্চল।[৫৩] খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে রচিত নয়চন্দ্র সুরীর 'হম্মীর মহাকাব্যে'ও একই কথার উল্লেখ আছে।[৫৪] ষোড়শ শতকের তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা

---

৪৪ *Epigraphia Indica*, XVIII, pp. 74ff.

৪৫ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

৪৬ *Indian Antiquary*, Vol. XX, p. 375.

৪৭ D.C. Sarkar (ed), *Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization*, Vol. II, Delhi, 1983, p. 244.

৪৮ *গৌড়লেখমালা*, পৃ. ১৪০।

৪৯ *Inscriptions of Bengal*, p. 132ff.

৫০ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, part. 1, 1896, pp. 6ff.

৫১ *Indian Historical Quarterly*, Vol. IV, p. 637ff.

৫২ *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 125ff.

৫৩ *Ibid*, p. 140ff.

৫৪ *Indian Historical Quarterly*, Vol. XVI, p. 237.

তারানাথ বঙ্গালকে 'ভঙ্গল' নামে অভিহিত করেছেন।[৫৫] কুমিল্লার ময়নামতিতে প্রাপ্ত সপ্তম-অষ্টম শতকের একটি স্বর্ণ মুদ্রায়ও 'শ্রীভঙ্গল-মৃগাঙ্কস্য' উৎকীর্ণ হয়েছে। ময়নামতিতে প্রাপ্ত দেববংশীয় রাজা আনন্দদেব ও ভবদেবের দু'খানি তাম্রলিপির উপরে সংযুক্ত সিলে এই একই কথা লিপিবদ্ধ আছে।[৫৬] খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বঙ্গ+আল অর্থাৎ বঙ্গাল নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৭] ভৌগলিক অঞ্চল হিসেবে বঙ্গালের লেখমালাভিত্তিক সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় রাষ্ট্রকূটরাজ ৩য় গোবিন্দের (৭২৭ শকাব্দ/আ. ৮০৫ খ্রি.) পাঠান (নেসারিকা) তাম্রলিপিতে। এতে ধর্মকে (পাল রাজা ধর্মপাল) বঙ্গালের রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৮] রাজেন্দ্র চোলের (আ. ১০২৪ খ্রি.) তিরুমালাই প্রস্তরলিপিতে 'বঙ্গালদেশম' রাজ্যের রাজারূপে গোবিন্দচন্দ্রের নাম দেখা যায়। কলচুরিবাজ বিজ্জলের (আ. ১১৫৭-৬৭ খ্রি.) আবলুর লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গালকে পৃথক রাজ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৯] বিপুলশ্রীমিত্রের (আ. ১২শ শতক) নালন্দা প্রস্তরলিপিতে করুণাশ্রীমিত্র নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর মৃত্যুর কথা বর্ণিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে বরেন্দ্রের সোমপুর বিহারে তাঁর গৃহ।[৬০] রাজা শ্রীচন্দ্র তাঁর পশ্চিমভাগ লিপিতে সিলেট অঞ্চলে 'বঙ্গাল মঠ' ও দেশান্তরীয় মঠের উল্লেখ করেছেন। এ উল্লেখ থেকে ধারণা করা হয় বঙ্গালের সীমানা উত্তর-পূর্বদিকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।[৬১]

সমতট

বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদসমূহের মধ্যে সমতট তার স্বতন্ত্র অবস্থান ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। বরাহ-মিহিরের (আ. খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক) 'বৃহৎসংহিতা'য় সমতটকে বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি ও বর্ধমান থেকে পৃথক এক জনপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬২] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙ সমতটে এসেছিলেন এবং তার ভ্রমণ কাহিনীতে সন-মো-ত-ত শব্দটি ব্যবহারযোগে সমতট জনপদকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি সমতটকে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য একজন পর্যটক ইৎ সিঙ-এর সহযাত্রী সেঙ-চি খড়্গবংশীয় রাজা রাজভটকে সমতটের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৩] লেখমালা সাক্ষ্যে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকেই সমতট একটি স্বতন্ত্র জনপদ ছিল বলে জানা যায়। সপ্তম শতকে কুমিল্লা শহর হতে ১২ মাইল পশ্চিমে বড়কামতা (কর্মান্ত) সমতটের রাজধানী ছিল।[৬৪] গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমতট, ডবাক, কামরূপ,

---

[৫৫] R.C. Mojumder (ed), *op.cit.*, p. 167.

[৫৬] Bangladesh Lalitkala, *Journal of the Dacca Museum*, Vol. 1, p.50.

[৫৭] *Ain-i-Akbari*, p. 120.

[৫৮] *Epigraphia Indica*, XXXIV, pp. 123ff & 137ff.

[৫৯] *Epigraphia Indica*, V, pp. 257ff.

[৬০] *Ibid*, XXI, p. 98ff.

[৬১] Kamalakanta Gupta, *op.cit*., p. 98.

[৬২] *Brihatsamhita*, Benaras, XIV, p. 6-8.

[৬৩] S. Beal, *Life of Hiuen Tsang By Shaman Hwui-li*, London, 1911, pp. XI-XII.

[৬৪] *Epigraphia Indica*, XVII, p. 355.

নেপাল ও কর্তৃপুর নামে আরও বেশকিছু জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৫] শ্রীধারণরাতের (৬৭৫ খ্রি.) কৈলান তাম্রলিপিতে দেবপর্বতকে সমতটের রাজধানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৬] দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেববংশীয় রাজা আনন্দদেব ও তাঁর পুত্র ভবদেবের (খ্রি. ৭ম শতক) তাম্রলিপিতেও দেবপর্বত সমতটের রাজধানী বলে উল্লেখ আছে।[৬৭] দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের (খ্রি. ১০ম শতক) পশ্চিমভাগ তাম্রলিপিতে উল্লেখ আছে যে, শ্রীচন্দ্রদেবের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব রাজধানী দেবপর্বতসহ সমতট জয় করেন। তাম্রলিপিতে উল্লেখিত লালম্বী বনকে বর্তমান কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের উত্তরাংশ বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।[৬৮] ময়নামতিতে উৎখননে চারপত্রমুড়া নামক পাহাড়ে চারখানা তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে দু'খানা তাম্রলিপির ভূমিদানকর্তা হলেন চন্দ্ররাজা লডহচন্দ্র, অপর একখানা তাম্রলিপির দাতা তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ও সর্বশেষ তাম্রলিপির দাতা হলেন জনৈক স্থানীয় রাজা। লক্ষণীয় যে চারখানা লিপিতেই পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত সমতট মণ্ডলে ভূমিদানের উল্লেখ আছে।[৬৯] পালবংশীয় রাজা ১ম মহীপালের ৩য় ও ৪র্থ রাজ্যাঙ্কে নির্মিত বাঘাউরা[৭০] নারায়ণপুর[৭১] মূর্তিলিপিতেও সমতটের উল্লেখ আছে। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রলিপিতেও সমতটের কথা বলা হয়েছে।[৭২] এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পরবর্তী দেববংশীয় রাজা দামোদরদেবের (খ্রি. ১৩শ শতক) মেহের তাম্রলিপিতে ও শোভারামপুর তাম্রলিপিতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত সমতট মণ্ডলের উল্লেখ রয়েছে।[৭৩]

হরিকেল

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে হরিকেল অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। এর সঠিক অবস্থান নিয়ে মতদ্বৈততা লক্ষণীয়। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত তাম্রলিপি ও মুদ্রায় হরিকেল নামের উল্লেখ আছে। তবে হরিকেল জনপদ সম্পর্কে যতই অস্পষ্টতা থাকুক না কেন সমকালীন রাজা বা রাজবংশ কর্তৃক জারিকৃত কিছু লেখমালা বা ভূমিদানপত্র বা ভূমিক্রয়পত্রে হরিকেল জনপদের স্পষ্টতা প্রমাণ করে। বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থ 'ডাকার্ণবে' শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চলে হরিকেলের অবস্থান বলে উল্লেখ আছে। অন্যদের মতে, হরিকেলের অবস্থান চট্টগ্রাম অঞ্চলে। খ্রিস্টীয় নবম শতকের সংস্কৃত কবি রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' গ্রন্থে হরিকেলির সুন্দরী রমণীদের উল্লেখ আছে।[৭৪]

---

৬৫ J.F. Fleet (ed), *Corpus Inscriptionum Indicarum*, p. 141.

৬৬ *Indian Historical Quarterly*, Vol. III, p. 14ff.

৬৭ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Letters, Vol. XVII 1896, p. 127ff.

৬৮ D.C. Sarkar (ed), *Epigrafhic discovaries in East Pakistan*, Calcutta, 1973, pp. 19ff.

৬৯ F.A. Khan, *Mainamati*, Karachi, 1965, pp. 5ff.

৭০ *Epigraphia Indica*, XVII, p. 353ff.

৭১ *Indian Cultural*, Vol. VII, pp. 121ff.

৭২ *Indian Antiquary*, Vol. XV, pp. 3off.

৭৩ *Epigraphia Indica*, XVII, p. 353ff.

৭৪ R.C. Mojumder, *History of Ancient Bengal*, Calcutta, 1974, pp. 2-3.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কিছু মধ্যযুগীয় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে, যেমন, 'রূপচিন্তামণি' (১৫১৫ শকাব্দ) ও 'রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য'-এর কৃতসার অংশে হরিকেলের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। রূপচিন্তামণির মতে, শ্রীহট্ট তথা বর্তমান সিলেটের অপর নাম হরিকেল। আবার রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যও একই মত পোষণ করে। তবে চট্টগ্রাম শহরের এক মন্দিরে প্রাপ্ত কান্তিদেবের তাম্রলিপিতে (খ্রি. ৯ম শতক)[৭৫] হরিকেল মণ্ডলের 'ভবিষ্যৎ-শাসকদের' নামের উল্লেখ আছে। যদি তাম্রলিপির প্রাপ্তিস্থান ও জারিকৃত স্থান একই হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বর্তমান চট্টগ্রাম শহরাঞ্চল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে বৃহত্তর হরিকেল মণ্ডলের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। আবার মুদ্রার লিপি সাক্ষ্যেও চট্টগ্রাম অঞ্চলেই হরিকেল রাজ্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭৬] সম্ভবত বৃহত্তর চট্টগ্রামের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলই হলো হরিকেল রাজ্য।[৭৭]

চন্দ্রদ্বীপ

মধ্যযুগের বাংলার প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপ একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। জনপদ হিসেবে এর সর্বপ্রাচীন উল্লেখ রয়েছে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রলিপিতে। পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ঐ দ্বীপে রাজ্য লাভ এবং পরবর্তীতে দ্বীপের সাথে চন্দ্র যোগ হয়ে 'চন্দ্রদ্বীপ' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৭৮] বিভিন্ন লেখমালার উল্লেখ থেকে মনে হয়, বর্তমান বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ জনপদ। সময়ে সময়ে এর আয়তন খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চল পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছিল।[৭৯] খ্রিস্টীয় ১০১৫ শতকে রচিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামের একটি বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিতে চিত্রিত বৌদ্ধদেবী তারার পরিচিতিতে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে। এতে বলা হয়েছে, 'চন্দ্রদ্বীপে ভগবতি তারা।'[৮০] পাণ্ডুলিপির রচনাকালের ১০০ বা ২০০ বছর আগে থেকেই ভৌগলিক অঞ্চল হিসেবে চন্দ্রদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষৎ তাম্রলিপিতে[৮১] বঙ্গালবড়া ও ন্দ্রদ্বীপ নামে দুটি স্থানের উল্লেখ আছে। সম্ভবত ন্দ্রদ্বীপই হলো চন্দ্রদ্বীপ। আবার বরিশালের গৌরনদীর রামসিদ্ধিপাটক গ্রামের দক্ষিণাংশকে বঙ্গালবড়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে। লিপিতে দানকৃত গ্রামের মধ্যে অন্য একটি গ্রাম হলো ঘাঘরকাট্টি পাটক। কবি বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে ঘাঘর নদীর উল্লেখ রয়েছে। মুঘল শাসক আকবরের সুবাহ-ই-বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল এই চন্দ্রদ্বীপ।

---

[৭৫] *Epigraphia Indica,* XXVI, pp. 313ff.

[৭৬] *Journal of the Numismatic Society of India,* Vol. XXIV 1896, pp. 141-142.

[৭৭] Bangladesh Lalitkala, *op.cit.*, p.50.

[৭৮] *Inscriptions of Bengal*, III, p. 7.

[৭৯] W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. V, London, 1875, p. 224.

[৮০] N.K. Bhattasali, *Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum,* Dacca, 1929, p. 12.

[৮১] *Inscriptions of Bengal*, III, p. 140ff.

পট্টিকেরা

সমতট জনপদের সমসাময়িক অপর একটি ভৌগলিক অঞ্চল ছিল পট্টিকেরা। সম্ভবত বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল পট্টিকেরা। পট্টিকেরার প্রাচীনত্ব বুঝা যায় 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' নামের একটি বৌদ্ধ পুঁথি থেকে। এই পুঁথির রচনাকাল ৯৩৭ শকাব্দ (১০১৫ খ্রি.) এবং এটি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই পুঁথিতে ১৬ হাত বিশিষ্ট চুণ্ডা নামের এক বৌদ্ধদেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। প্রতিকৃতির নিচে পরিচিতি হিসেবে লেখা আছে, পট্টিকেরে চুণ্ডা-বরভবনে চুণ্ডা।[৮২] বৃহত্তর ময়নামতি উৎখননে প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। সপ্তম-অষ্টম শতকের ঐ মুদ্রা পট্টিকেরা থেকে উৎকীর্ণ বলে উল্লেখ আছে।[৮৩] পট্টিকেরার লেখমালাভিত্তিক উল্লেখ পাওয়া যায় চন্দ্রবংশীয় লডহচন্দ্রের (আ. খ্রি. ১০০০-১২০০) দু'খানা ময়নামতি লিপিতে। এগুলোকে পৌণ্ড্রভূক্তির অন্তর্গত সমতট মণ্ডলের 'শ্রীপট্টিকেরা'কে ভূমিদান করা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে।[৮৪] কুমিল্লার কাছে পট্টিকেরার অস্তিত্বের লেখমালাভিত্তিক অপর নিদর্শন হলো খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শ্রীরণবঙ্কমল হরিকালদেবের ময়নামতিতে প্রাপ্ত অন্য একটি লিপিতে। এই লিপি অনুযায়ী (১২২০ খ্রি.) পট্টিকেরা নগরে সে দেশের রাজা রণবঙ্কমল একটি বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য কিছু ভূমিদান করেন।[৮৫] বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে যে একদা পট্টিকেরা নামে একটি নগরীর অস্তিত্ব ছিল তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় ময়নামতির পাহাড়ি এলাকায় পট্টিকেরা বা পাইটকারা নামের একটি পরগণার অস্তিত্ব থেকে। লেখমালা, মুদ্রা এবং ব্রহ্মদেশীয় কাহিনীতে পট্টিকেরার উল্লেখ থেকে মনে হয় এই নগরীর চতুর্দিকের অঞ্চল নগরীর নামানুসারে হয়েছিল অথবা অঞ্চলের নাম থেকে নগরীর নাম পট্টিকেরা হয়েছিল। তবে অন্য কোন তথ্যের অভাবে পট্টিকেরা নগরীর অবস্থান কোথায় ছিল তা বলা যায় না।[৮৬]

শিলালেখ-তাম্রপট্টোলিতে প্রাচীন বাংলার গ্রাম-স্থাননাম ও সমাজ

বরেন্দ্র জনপদের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার (সোমপুর বিহার), সীতাকোট বিহার, জগদ্দল বিহারসহ অসংখ্য প্রত্নস্থল প্রত্নসম্পদের এক মহা ভাণ্ডার হিসেবে সারাবিশ্বের কাছে পরিচিত। সারা বরেন্দ্রের বুক জুড়েই রয়েছে এর ব্যাপ্তি। উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য মূর্তি, শিলালিপি, তাম্রলিপিসহ নানা প্রত্নসম্পদ। বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সব শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে গুপ্তযুগের ১টি, পালযুগের ৬টি এবং সেন আমলের ৩টি ভূমিদান লিপি। ঐসব লিপি ভাষ্যে বরেন্দ্রসহ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের স্থাননাম ও গ্রামের নামের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যেও গ্রামনামের উল্লেখ আছে। শিলালিপি ও তাম্রলিপিতে বিভিন্ন শ্রেণির প্রশাসনিক অঞ্চলের নাম, অবস্থান এবং কতিপয় গ্রামের নাম সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য

---

[৮২] N.K. Bhattasali, *op.cit.*, p. 12.

[৮৩] Bangladesh Lalitkala, *op.cit*., p. 47.

[৮৪] *Pakistan Archaeology*, No. 3, 1968, pp. 40ff.

[৮৫] *Indian Historical Quarterly*, Vol. IX, p. 282ff.

[৮৬] *Ibid*, p. 284.

রয়েছে। প্রাচীন বাংলার গ্রাম ও নগর বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে। এসময়ে চট্ট, ভট্ট, বন্দ্য ইত্যাদি গ্রাম নামে ব্রাহ্মণদের পরিচিত হতে দেখা যায়। গাঞী বা গ্রামের ব্যবহার এই সময়েই বস্তুত অর্থে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথাসিদ্ধভাবে গাঞী বা গ্রামের ব্যবহার শুরু হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত শিলালিপি-তাম্রশাসনে দিণ্ডী, পালি, সেউ, চম্পাহিটী বা চম্পাহট্টীয়, মাসচটক বা মাসচড়ক, মুল সেহন্দরী, পুতি, মহান্তিয়াড়া, করঞ্চ, তটক, মৎসবাস, ভট্টশালীর পীতাম্বর, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক, কেশোরঙ্কোলীয় নাথক, বন্দীঘটীয়, সর্বানন্দ প্রভৃতি গাঞী বা গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়।[৮৭] এসব গ্রামের নাম ব্রাহ্মণদের পদবি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন লিপিমালায় এ ধরণের ১৫৬টি গাঞী বা গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়।[৮৮] কালক্রমে এই গাঞী বা গ্রাম পরিচয় প্রথা বিস্তৃত হয়ে একটি ভৌগলিক সীমারেখার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন গ্রাম কেবল ব্রাহ্মণের পরিচয়ের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকেনি; বিস্তৃত হয়েছে তার পরিধিও।

বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলোর মধ্যে সর্বপ্রাচীন হলো বগুড়ার মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মীলিপিটি। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়ের এই ব্রাহ্মীলিপিখানিতে নগর হিসেবে পুণ্ড্রের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। এই লিপিতে 'পুদনগল' নামে যে নগরীর উল্লেখ রয়েছে তা মূলত ঐতিহাসিক পুণ্ড্রনগরী বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।[৮৯] পরবর্তীতে প্রাপ্ত অন্যান্য শিলালিপি পাঠেও জানা যায় যে, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত শাসনকালে পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্র নামে পরিবর্তিত হয়। এটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূক্তি বা প্রদেশ ছিল এবং এ অবস্থা গুপ্ত পরবর্তী অন্যান্য রাজবংশের সময়েও অপরিবর্তিত থাকে।[৯০] প্রাচীন লেখমালাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাজা কর্তৃক শাসিত অঞ্চলগুলো যথাক্রমে ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথী ও গ্রাম- এই সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাগ ছিল ভুক্তি এবং গ্রাম ছিল সবচেয়ে ছোট উপবিভাগ। উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত এই পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির আয়তন ছিল।[৯১]

শিলালেখ-তাম্রশাসনাদিতে বাংলার অসংখ্য প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের আকার সর্বত্র এক ধরণের ছিল না। ছোট বড় নানা আকার ও আয়তনের ছিল। ছোট গ্রামের

---

[৮৭] এস. এম. রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫০-৫১।

[৮৮] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

[৮৯] *Epigraphia Indica*, Vol. XXI, p. 83.

[৯০] *Epigraphia Indica*, Vol. XVII, p. 345.

[৯১] Noni Gopal Mojumder, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, Rajshahi, 1929, pp. 140.

পরিচয় ছিল পাটক (পাড়া) হিসেবে। ষষ্ঠ শতকের দামোদর পট্টোলিতে[৯২] দু'টি পাটকের নাম পাওয়া যায়; এর একটি পুরাণ-বৃন্দিক হরিপাটক অপরটি স্বচ্ছন্দ পাটক। আবার বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম[৯৩] শাসনে ত্রিবৃতা ও শ্রীগোহালী নামে দুটি পাটকের নাম পাওয়া যায়। গ্রাম সাধারণত গড়ে উঠতো নদী বা জলাশয়ের ধারে যেখানে কৃষি কাজের জন্য উপযুক্ত ভূমি এবং যাতায়াতের সুবিধা থাকতো। এভাবে গড়ে উঠা গ্রাম শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পেতো। অনেক সময় রাজা বা তার কোন ক্ষুদ্র প্রতিনিধিকেও এই শ্রেণির বর্ধিষ্ণু গ্রামে বসবাস করতে দেখা যেতো। গ্রাম ছোট হোক-বড় হোক, বর্ধিষ্ণু হোক আর নাই হোক সব গ্রামই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা-একটি বাস্তুভূমি অপরটি ক্ষেত্রভূমি। এছাড়াও গ্রামে থাকতো গো-চারণভূমি, তলভূমি, গর্তভূমি, উশরভূমি এবং গোপথ বা গোবাট বা গোমার্গভূমি। গোচর বা গোচারণভূমির অবস্থান ছিল কৃষি জমির ধারে। গ্রামের সীমানা ঘেঁষে গ্রামের ভিতর পর্যন্ত ছিল গোপথ, গোমার্গ বা গোবাট। কোন কোন গ্রামে হট্ট বা হাট ছিল। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই খাল, বিল, জোলা, জোলক, জোটিকা, খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকা, খানিকা, স্রোতিক, দীপ্ত, দীপিকা, গাঙ্গিনিকা, উশর হজ্জিক ও পুষ্করিণী ছিল।[৯৪] উপর্যুক্ত নামগুলো এখনও অবিকৃত অবস্থায় প্রচলিত আছে। জোলা শব্দ উত্তর-পূর্ব বাংলায় এখনও অনতিপ্রসর খালকে বুঝায়। জোলক বা জোটিকা জোলা শব্দের সমার্থক। খাট, খাটা, খাটিকা ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হয় খাল অর্থে। অনুশাসনের খাড়িমণ্ডল সম্ভবত খাল বহুল জনপদ অর্থেই ব্যবহৃত হতো। খানিকা, স্রোতিকা, গাঙ্গিনিকাও খাড়ির সমার্থক। মরা নদীর খাত অর্থে গাঙ্গিনিকা এখনও পরিচিত। হট্ট, হট্টি, গ্রামের হাট এবং ঘট্ট বা ঘাট হিসেবে পারাপার ঘাট বা খেয়াপারের ঘাট হিসেবে এখনও প্রচলিত। উষর অর্থে অনুর্বর অকর্ষণযোগ্য জমিকে বুঝানো হতো।

গ্রামের বাইরে গো-চারণভূমির পাশেই ছিল বন বা অরণ্য। এই বন বা অরণ্য পরিষ্কার করেই যে গ্রামের পত্তন হতো তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে তাম্রপট্টোলিতে। লোকনাথের তাম্রপট্টোলিতে[৯৫] লিপিবদ্ধ আছে, লোকনাথ সর্প-মহিষ-ব্যাঘ্র বরাহ অধ্যুষিত আটবি ভূ-খণ্ডকে গ্রামরূপ দেবার জন্য দু'শ এগারোজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, গ্রাম পত্তনির পর সঝাটবিপট অর্থাৎ বন থেকে লোকেরা জ্বালানী কাঠ এবং ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য বাঁশ, খুটি প্রভৃতি সংগ্রহ করতো। প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলোর আকার আয়তন কেমন ছিল তাম্রশাসনে তারও বর্ণনা রয়েছে। বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপিতে (শ্লোক: ৩৭-

---

[৯২] রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম তাম্রশাসন, *Epigraphia Indica*, Vol. XV, p. 129.

[৯৩] রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম তাম্রশাসন, *Epigraphia Indica*, Vol. XXI, p. 78.

[৯৪] তাম্রশাসনে উল্লিখিত প্রতিটি নামই খাল-বিল, নদী-নালায় ভরা বাংলার নদীমাতৃক পরিবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

[৯৫] দীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীধারণরাতের কইলান শাসন, *Indian Historical Quarterly*, Vol. XXIII, pp. 232-233.

৫৪)[৯৬] বল্লাহিটঠা নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে, যার বাস্তুভিটা, আবাদি জমি, উষর বা পতিত জমি, খাল-বিলসহ আয়তন ছিল ৭ দ্রোণ ১ আঢ়ক ৩৪ উম্মান ৩ কাক। ঐ গ্রামের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৫০০ কপর্দক পুরাণ। লক্ষণ সেনের তর্পনদিঘি শাসনে[৯৭] বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেলহিষ্টি নামে একটি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়, যার আয়তন ছিল, ১২০ আঢ়াবাপ ৫ উম্মান এবং বার্ষিক উপত্তিক বা উৎপাদন ছিল ১৫০ কপর্দক পুরাণ। এই সেন রাজার গোবিন্দপুর পট্টোলিতে[৯৮] বিড্ডারশাসন নামের একটি গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। যার আয়তন ছিল মাত্র ৬০ ভূদ্রোণ ১৭ উম্মান। উল্লেখ্য, পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীন বরেন্দ্রীতে অবস্থিত উপর্যুক্ত বেলহিষ্টি গ্রাম নিষ্কর হিসেবে রাজা হেমাম্বরথ মহাদানের জনৈক আচার্য ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী এক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন। অনুশাসনসমূহের বিবরণ থেকে বুঝা যায়, সে সময় ছোট বড় নানা আকারেরই গ্রাম ছিল।

জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার সিলিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের ৪নং শ্লোকে বালগ্রাম, শরাবস্তি, তরাকরি প্রভৃতি গ্রামের নাম পাওয়া যায় এবং গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত শক্তি নামের একটি নদীখাতের বর্ণনা রয়েছে।[৯৯] এই শাসনে ছোট খাল হিসেবে জোলিকা এবং হাজা বা হাজিকার (Haja/Hajika) উল্লেখ আছে। ২২৪ গুপ্তাব্দের দামোদর শাসনে[১০০] পলাশবৃন্দক নামে একটি স্থানের বর্ণনা রয়েছে। এই স্থান হতেই শাসনোক্ত ভূমিদান বিষয়ক রাজকীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছিল। অনুশাসনের পলাশবৃন্দক একটি বড় গ্রাম কিংবা কয়েকটি ছোট গ্রামের সমষ্টিবিশেষ ছিল। বর্তমান দিনাজপুর শহরের অদূরে পলাশবাড়ি এবং পলাশডাঙ্গা নামক গ্রাম দুটিকে ঐ পলাশবৃন্দক হিসেবে কোন কোন ঐতিহাসিক শনাক্ত করেছেন। আরও বেশকিছু গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় বগুড়া জেলার বৈগ্রামে প্রাপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম তাম্রশাসনে। গ্রামগুলি হলো পুরানবৃন্দিক হরি, পৃষ্টিমপট্টোক, গোষাটপুঞ্জক, নিত্যগোহালী, বটগোহালী, শ্রীগোহালী, ত্রিবৃতা প্রভৃতি।[১০১] তবে শ্রীগোহালী এবং ত্রিবৃতা বায়িগ্রাম বা বৈগ্রামের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে মনে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, বটগোহালী গ্রাম পাহাড়পুরের গোয়ালভিটা গ্রাম। ধর্মপালের খালিমপুর[১০২] শাসনে কৌঞ্জশুভ্র গ্রামের অনিন্দ সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রামটির পশ্চিমদিকে গাঙ্গিনিকা (মরানদী), উত্তরদিকে দেবকুল (দেউল), পূর্ব-উত্তরে আলী (সেতু) গিয়ে শেষ হয়েছে লেবুবনে। গ্রামে বসবাসকারী কায়স্থ, মহামহোত্তর প্রভৃতি বিষয় ব্যবহারজীবী এবং

---

[৯৬] Noni Gopal Mojumder, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, Rajshahi, 1929, pp. 99-105.

[৯৭] Noni Gopal Mojumder, *op.cit.*, pp. 99-105.

[৯৮] Noni Gopal Mojumder, *op.cit.*, pp. 92-98.

[৯৯] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

[১০০] দীনেশচন্দ্র সরকার, বুধগুপ্তের দামোদর তাম্রশাসন, *Select Inscription bearing on Indian History and Civilization*, Calcutta, 1965, pp. 332-333.

[১০১] দীনেশচন্দ্র সরকার, প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম তাম্রশাসন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬-৩৫৮।

[১০২] *গৌড়লেখমালা*, পৃ. ২৪-২৫।

পেশাজীবীদের সর্বপূজনীয় ছিলেন গ্রামের ব্রাহ্মণেরা। বন্যগুপ্তের ষষ্ঠ শতকের গুণাইঘর তাম্রশাসনে[১০৩] কন্তেড়ডক নামে একটি গ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রামটির অবস্থান নিম্নভূমিতে হলেও গ্রামে মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি সংঘ ও দু'টি ছোট বিহার ছিল। তাম্রশাসনের ১৮ থেকে ২৮নং শ্লোকে ঐ বিহারের চারপাশে বিলাল (বিল) হজ্জিক, খিলভূমি (খাল), নৌঘাট, নৌযোগখাট থাকায় মনে হয় গ্রামটি[১০৪] দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত। হয়তো এখানে একটি ছোট নৌ-বন্দরও ছিল। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়[১০৫] প্রাপ্ত গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের শাসনসমূহে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গের জলাশয় ঘেরা অধিকাংশ ভূমিতে বন্য জীবজন্তু ঘুরে বেড়াতো, তেমন কোন ফসল হতো না। এ কারণে রাজকোষে কোন অর্থও জমা হতো না। তবে কোটালিপাড়া অঞ্চল যে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তা লিপির নৌযোগ, নৌদন্ডক, নাবাতাক্ষেণী, নৌখাট শব্দের ব্যবহার থেকেই অনুমিত হয়। রাজেন্দ্রচোলের অভিলেখতে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গালদেশের অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই দেশটিকে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় থেকে পৃথক করা হয়েছে। চোল সৈন্যরা পালবংশীয় রাজা প্রথম মহীপালকে পরাজিত করে উত্তররাঢ়ে এবং গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়েছিল। এই উত্তররাঢ় এবং নিকটবর্তী অঞ্চল মহীপালের রাজ্যভূক্ত ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন বঙ্গের ন্যায় এই বঙ্গালদেশও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে[১০৬] উল্লেখ আছে, প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের রাজাগণ প্লাবন নিবারণের জন্য ১০ গজ উঁচু আয়ত মৃত্তিকা নির্মিত এক একটি আল প্রস্তুত করাতেন এবং সেজন্য বঙ্গ যুক্ত আল এই দুই শব্দযোগে বঙ্গাল নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই নিরুক্তি পাঠে মনে হয় যে, বঙ্গের সমুদ্র সন্নিহিত এবং নদী-নালাবহুল দক্ষিণবঙ্গে লোনাজলের বান নিবারণের জন্য পুর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল এবং কালক্রমে ঐ অঞ্চল বঙ্গাল নামে খ্যাতি লাভ করে। বিশ্বরূপ সেনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাম্রশাসনে বঙ্গের নাব্য অঞ্চলে অবস্থিত রামসিদ্ধিপাটক এবং বঙ্গালরড়াপাটক নামে দু'টি স্থানের উল্লেখ আছে। বাখেরগঞ্জের উত্তরে গৌড়নদী থানার অন্তর্গত রামসিদ্ধি এবং বঙ্গরড়া নামক স্থানদ্বয়ের সাথে ঐ দু'টি স্থান অভিন্ন বলে অনুমান করা হয়।[১০৭]

বৃহত্তর রাজশাহী (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ) জেলায় বেশকিছু শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে প্রচুর সামাজিক ইতিহাসের উপাদান রয়েছে। প্রাপ্ত অভিলেখমালার তিনখানি তাম্রপট্টোলি এবং দুইখানি প্রশস্তি। তিনখানি তাম্রপট্টোলিই গুপ্ত আমলের। সেগুলো হলো-প্রথম কুমারগুপ্তের 'কলইকুড়ি-সুলতানপুর অনুশাসন', দ্বিতীয়খানি প্রথম কুমারগুপ্তের 'ধনাইদহ অনুশাসন' এবং তৃতীয়খানি ৪৭৯ খ্রিস্টাব্দের 'পাহাড়পুর অনুশাসন'। প্রশস্তি দু'খানি হলো-

---

[১০৩] দীনেশচন্দ্র সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০-৩৪৪।

[১০৪] গ্রামটি দক্ষিণবঙ্গের বর্তমান যশোর জেলার ভরত-ভায়না বলে অনুমিত হয়।

[১০৫] দীনেশচন্দ্র সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮।

[১০৬] Abul Fadl, *Ain-i-Akbari*, (Translated by Jerrets), Vol. II. p. 120.

[১০৭] ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮২ পৃ. ১৫০-১৫১।

পাল শাসক নারায়ণ পালের 'বাদাল প্রশস্তি' এবং অপরটি সেনরাজ বিজয়সেনের 'দেওপাড়া প্রশস্তি'। এসব অভিলেখে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং সমকালীন ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রথম কুমারগুপ্তের কলইকুড়ি-সুলতানপুর তাম্রশাসনে (৪৩৯ খ্রি.)[১০৮] পুণ্ড্রবর্ধনভূক্ত কয়েকটি প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামগুলো হলো-হস্তিশীর্ষ বিভীতকী, গুল্মগন্ধিকা, ধান্যপাটলিকা এবং সংগোহালী। অভিলেখটিতে শৃঙ্গরের বীথির অন্তর্গত পূর্ণকোশিকা থেকে অচ্যুৎদাস নামক আয়ুক্তক এবং ঐ বিথীর অধিকরণ কর্তৃক তিনজন (দেবভট্ট, অমরদত্ত ও মহাসেনদত্ত) ব্রাহ্মণকে অক্ষয়নীবী স্বরূপ ভূমিদান সম্পর্কে হস্তিশীর্ষ, বিভীতকী, গুল্মগন্ধিকা, ধান্যপাটলিকা এবং সংগোহালী গ্রামের ব্রাহ্মণাদি কুটুম্বীদিগের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ লিপিবদ্ধ আছে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ দৈনিক কর্তব্য পঞ্চক-অধ্যাপন, তর্পণ, হোম, বলি এবং অতিথি আপ্যায়নার্থে রাজা কর্তৃক এই গ্রামের ভূমিদান করা হয়।[১০৯] ধনাইদহ অনুশাসনে লেখা নীবীধর্মক্ষয়েন[১১০] নিজ ইচ্ছায় ভূমি দান- বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। পাহাড়পুর তাম্রশাসনে ভূমি দান হিসেবে নয়, ভূমি ক্রয় করছেন নাথশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রী রামী। এতে উল্লেখ আছে, 'শাশ্বতকালেলাপভোগাৎক্ষয়নীবী সমুদয় বাহ্য প্রতিকর' জমি দান করা হলো অক্ষয়নীবী শর্তে সকল প্রকার রাজস্ব বিবর্জিত ভাবে।[১১১] প্রাপ্ত তিনখানি তাম্রপট্টোলিতেই কুলিক (শিল্পকর), কায়স্থ (লিপিকর), পুস্তপাল (দলিল পত্রাদি রক্ষক), কুটুম্বী (কৃষক) সম্প্রদায়ের পরিচয় সংরক্ষিত আছে। আরো আছে গ্রামষ্টকুলাধিকরণ, বীথ্যধিকরণ, বিষয়াধিকরণ নামের শাসনস্তরের কথা। সবগুলো তাম্রশাসনেই ধানোৎপাদনে কৃষি ব্যবস্থার সাথে জড়িত ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের কথা উক্ত হয়েছে। বাদাল প্রশস্তিতে উৎকীর্ণ হয়েছে পাল শাসক নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরুবমিশ্রের তথ্যাদি। পাল নৃপতি বিগ্রহপালের মন্ত্রী দেকারমিশ্র 'চতুর্বিদ্যা পায়োনিধি' পান করেছিলেন অর্থাৎ চারবেদবিদ ছিলেন, তার পিতা দর্ভপাণিও বেদবিদ ছিলেন।[১১২] কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্র নীতি, আগাম ও জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত, বেদার্থচিন্তাপরায়ণ এবং অধিকতর পারদর্শী ছিলেন যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখায়। প্রশস্তির উপমা, রূপক, অনুপ্রাস এবং অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্যদিয়ে ধর্ম ও আগাম শাস্ত্রচর্চার যে উপাদান রয়েছে, তা থেকে মনে হয় এ অঞ্চলে পাল আমলেই এ শাস্ত্রপাঠের ঐতিহ্য গড়ে উঠে যার সাথে একটা গভীর যোগসূত্র ছিল মধ্যভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতির। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে রাণক শূলপাণির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১১৩] তিনি খোদাইয়ের কাজে সেন আমলে এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, তাকে 'বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি' উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। লক্ষণ সেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁর 'পবনদুত' কাব্যে নিদ্রাবলী বা নিদ্রালী নামে

---

[১০৮] ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, পৃ. ২১।

[১০৯] প্রথম কুমারগুপ্তের (৪১৪-৪৫৫ খ্রি.) *কলইকুড়ি-সুলতানপুর তাম্রশাসন*, শ্লোক ১।

[১১০] প্রথম কুমারগুপ্তের (৪৩২-৪৩৩ খ্রি.) *ধনাইদহ তাম্রশাসন*, শ্লোক ৮।

[১১১] ১৫৯ গুপ্তাব্দে (৪৭৯ খ্রি.) প্রণীত *পাহাড়পুর তাম্রশাসন*, শ্লোক ৪।

[১১২] *নারায়ণপালের দেওপাড়া প্রশস্তি*, শ্লোক ৪।

[১১৩] বিজয়সেনের *দেওপাড়া প্রশস্তি*, (একাদশ শতকের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ব্রাহ্মী হরফে লিখিত) শ্লোক ৩৬।

একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের কথা উল্লেখ করেছিলেন; যেখানে বসবাস ছিল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের। নিদ্রাবলী বা নিদ্রালী গ্রাম এখন আর নেই। রাজশাহী মহানগরীর অদূরে ছিল বিজয় সেনের রাজধানী বিজয়নগর। বিজয়নগর পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়েছে। হারিয়ে গেছে নিদ্রাবলী বা নিদ্রালী গ্রামও।[১১৪] রাজশাহী শহর থেকে সাত কিলোমিটার উত্তরে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে সিঁদুর কুসুম্বী গ্রামের অবস্থান। প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে যে মৃৎশিল্পের গৌরবময় অতীত ছিল তার উল্লেখ রয়েছে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' (rgyagar-chos-byun) গ্রন্থে।[১১৫] তিনি বরেন্দ্রের দুই কীর্তিমান ভাস্কর ধীমান পাল ও তাঁর পুত্র বিতপালের উল্লেখ করেছেন। দেওপাড়া শিলালিপিতে বিস্ময়কর আরেক শিল্পী রাণক শূলপাণির নাম উল্লেখ রয়েছে। লামা তারানাথের গ্রন্থে সিঁদুর কুসুম্বী গ্রামের উল্লেখ আছে। রাজশাহীর প্রাচীন ঐতিহ্য শখের হাড়ির জন্য এ গ্রামটি প্রাচীনকাল থেকেই সারা বিশ্বে নন্দিত। রাজশাহী-তানোর সড়ক ধরে সিঁদুর কুসুম্বী গ্রাম থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বসন্তপুর গ্রাম। রাজশাহীর শখের হাড়ির জন্য এ গ্রামটিও ইতিহাস খ্যাত। লামা তারানাথ বরেন্দ্রের যে দু'জন খ্যাতনামা মৃৎশিল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বিতপাল অন্যতম। এই বিতপালেরই নিবাস ছিল বসন্তপুর গ্রামে। বিতপাল থেকেই বিতপালপুর এবং বীতপালপুর লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে আজকের 'বসন্তপুর' গ্রামের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। লিপি সাক্ষ্যে কখনও কখনও অনেক অপাংক্তেয় গ্রাম রাজকীয় মর্যাদা লাভ করতে দেখা গেছে। লক্ষণ সেনের মাধাইনগর লিপির ফল্গুগ্রাম ও ধার্যগ্রাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেন শাসনামলে গ্রাম দু'টিতে জয়স্কন্ধবার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১১৬]

গোবিন্দচন্দ্রের পাইকপাড়া-বেতকা মূর্তিলেখে রুলজ নামক একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত স্থানটি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে অবস্থিত।[১১৭] বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গ অঞ্চলের বিক্রমপুর নামক ভাগে অবস্থিত পিঞ্জোকাষ্ঠী গ্রাম একজন ব্রাহ্মণকে দানের উল্লেখ আছে। শাসনটি তিনি জারি করেছিলেন তাঁর ফস্কো গ্রামের জয়স্কন্ধবার থেকে। পিঞ্জোকাষ্ঠীর অবস্থান ছিল পূর্বে অঠযাগ গ্রামের জাঙ্গাল সংলগ্ন ভূমি; দক্ষিণে বারয়ীপাড়া গ্রামান্তর্গত ভূমি; পশ্চিমে উঞ্জোকাট্টী গ্রামের ভূমি এবং উত্তরে বীরকাট্টীর জাঙ্গাল। পিঞ্জোকাষ্ঠী গ্রামে কন্দর্প শংকর আশ্রমের পদাতিশাপামার্ক নামীয় ১৩২ পুরাণ (চুর্ণী) বাদ দিয়ে সাংবাৎসরিক হিরণ্য ৫০০ পুরাণ এবং কন্দর্প শংকরের অধীন নাবডপ গ্রামের রাজার প্রতিপাল্য ব্যক্তিবিশেষের জায়গীরের সাংবাৎসরিক ১২৭ পুরাণ এই দুই মিলিয়ে সাংবাৎসরিক ৬২৭ পুরাণ এবং পিঞ্জোকাষ্ঠী গ্রাম দান করেন।[১১৮] দশরথ দেবের পাকামোড়া তাম্রশাসনে অসল্লা বিষয় নামক একটি গ্রামের

---

[১১৪] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

[১১৫] Lama Taranath, *History of Buddism in India*, Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1970, p. 348.

[১১৬] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

[১১৭] হরিআনন্দ বাড়রী, *আমার বিক্রমপুর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১২৭।

[১১৮] ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, পৃ. ২২৪।

পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানটি বর্তমান কুমিল্লা জেলার বড়কামতা অঞ্চলের একটি গ্রাম।[১১৯] প্রথম শূরপালের তাম্রশাসন সূত্রে শ্রীনগরভূক্তির অন্তর্গত ক্রোঞ্চধানক বিষয়ের অঙ্গার্গারগর্তিকা গ্রাম; দেবরাষ্ট্র বিষয়ের বাসন্তীগ্রাম ও কুলপুত্র গ্রাম এবং কল্মষনাশপার বিষয়ের নবল্লিকা গ্রাম বাংলার প্রাচীনত্বের স্মারক।[১২০] উক্ত অভিলেখে উল্লেখ আছে রাজবাড়ির ভৃত্যের স্ত্রীগণও গলায় হার, মালা, কানে কর্ণাঙ্গুরি, পায়ে মল, হাতে সুবর্ণ বলয় এবং পাথরের মহামূল্যবান ফুল ব্যবহার করতেন। অভিলেখে আরও উল্লেখ আছে, পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ পত্নীগণ নির্ধন ছিলেন বলেই নগরে এসে মুক্তা ও কার্পাস বীজে, মরকত ও শাকপাতায়, রূপা ও লাউফুলে রত্ন ও পাকা ডালিমের বীজে, সোনা ও কুমড়ার ফুলের পার্থক্য বুঝতে পারতেন না। নারীরা গলায় মালা পরতেন এবং খোঁপায় যে ফুল গুঁজতেন তার প্রমাণ রয়েছে নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপি এবং কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে। ভাগলপুর লিপিতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হয়ে পড়ায় লজ্জা আনতনয়না নারী কথঞ্চিৎ লজ্জা নিবারণ করছেন গলার ফুলের মালা দিয়ে বক্ষযুগল ঢেকে।[১২১] অপরদিকে বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপির ভাষ্যমতে, বিবাহিত নারীদের অনেকেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় নদী বা দিঘিতে অবগাহন করে প্রসাধনে বিভূষিত হতেন। কোনও কোনও নারী বক্ষযুগলে যে কর্পুর এবং মৃগনাভী মাখতেন তারও প্রমাণ রয়েছে লিপিভাষ্যে। মদনপালের মনহলি লিপি থেকে জানা যায়, সমাজের অভিজাত-অনভিজাত সকল নারী চোখে কাজল, ঠোঁটে লাক্ষারস এবং মাথায় ও পায়ে রং মাখতেন। তবে বিধবা হবার সাথে সাথে সকল নারীই সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতেন।[১২২]

অভিলেখমালায় বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। সমাজের অভিজাত শ্রেণি থেকে শুরু করে নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্যযন্ত্রের সমাদর ছিল বলে জানা যায়। প্রতি সন্ধ্যায় নগর-নন্দিনীদের নূপুর ঝঙ্কারে সভা ও আমোদগৃহগুলো পরিপূর্ণ হতো। গো-ঘৃত সহকারে গরম ভাত খাওয়ার রীতি লিপিমালায় বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। জমিতে ধান চাষের পাশাপাশি যবেরও চাষ হতো। কোন কোন অভিলেখে সেকালের বাঙালির দই, ক্ষীর, পায়েস প্রভৃতি খাবারের উল্লেখ আছে। তবে বাঙালির মৎস কিংবা মাংসপ্রীতি পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং পোড়ামাটির ফলকে পাওয়া গেলেও কোন লিপি সাক্ষ্যে উল্লেখ নেই। অভিলেখে ফল হিসেবে কেবল আম এবং কাঁঠালের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালির যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে নৌযান, গো-যান, হস্তী ও অশ্বযানের বর্ণনা পাওয়া যায় লিপিমালায়। ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর তাম্রশাসনে কোটালিপাড়ায় নৌবন্দর এবং সেখানে যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌযানের উল্লেখ রয়েছে, পাশেই ছিল গো-যানের আড্ডা। কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে হস্তিদন্ত নির্মিত বাহদন্তযুক্ত এক ধরনের পালকির উল্লেখ

---

[১১৯] *ঐ*, পৃ. ১৬৮।
[১২০] *ঐ*, পৃ. ২১৮।
[১২১] *গৌড়লেখমালা*, পৃ. ৫৫-৬৯।
[১২২] *গৌড়লেখমালা*, পৃ. ১৪৭-১৫৮।

আছে।[১২৩] বল্লাল সেন নাকি এই পালকিতে করেই রাজলক্ষীদের নিয়ে এসেছিলেন। প্রাচীন বাঙালির সেকালের দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে রয়ে গেছে প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য উপকরণ বিভিন্ন অভিলেখে। বিশেষ করে আমাদের সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে এই লিপি সাক্ষ্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপসংহার

বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি, অভিলেখমালা, প্রশস্তি এবং বিভিন্ন লিপিভাষ্যে প্রাচীন বাংলার শাসন পদ্ধতি, অর্থনীতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে উপাত্ত সংরক্ষিত রয়েছে তা নিরেট তথ্যমাত্র নয়; প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস বিনির্মাণের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অভিলেখমালাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সমকালীন সমাজে প্রাধান্য ছিল ব্রাহ্মণদের। অধিকাংশ তাম্রপট্টোলির দানগ্রহীতা কিংবা জমির ক্রেতা ছিলেন ব্রাহ্মণ। শিলালিপি, তাম্রশাসন অভিলেখমালায় বাঙালির প্রাচীন অনেক আঁকর উপাদান যেমন ভূগোল, শাসন পদ্ধতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির মতো অসংখ্য বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। লিপিমালায় বাঙালির বসন-ভূষণ, আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহারসহ নানা উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছে। লক্ষণসেনের আনুলিয়া লিপিতে তৎকালের উৎপাদিত ফসলের মধ্যে শালী ধানের উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা প্রাচীন বাঙালির সেকালের দৈনন্দিন জীবনের সমাজচিত্র বিচ্ছিন্নভাবে রয়ে গেছে প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য উপকরণ বিভিন্ন অভিলেখে। যা বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

[১২৩] Noni Gopal Mojumder, *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV, Varendra Research Society, Rajshahi, 1929, p. 55.